সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 42 | No. 1 | 1998

Check for updates

নজরুল ইসলামের শিক্ষা-চিন্তা

Volume	42
Issue	1
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জামরুল হাসান বেগ
Published online	October 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v42i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i1.4
Pages	139-152
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুল ইসলামের শিক্ষা-চিন্তা

জামরুল হাসান বেগ*

এক

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছিলেন একাধারে উপনিবেশের অধিবাসী ও উপনিবেশ বিরোধী। এই সত্যটির প্রতিফলন তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সত্য। আমরা জানি, কবিতার তুলনায় তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা নগণ্য। তবে কবিতার মতোই প্রবন্ধেও তাঁর প্রাণচেতনার স্পর্শ অনুভূত হয়। নজরুল রচিত প্রবন্ধের অধিকাংশই তাঁর সমকালীন দেশকাল ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, সংবাদপত্রের 'সম্পাদকীয়' প্রবন্ধের চাহিদাপূরণে রচিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর অভিভাষণগুলোতেও ভাব-ভাষা ও বিষয়বস্তু বিচারে, সর্বোপরি 'প্রকাশভঙ্গির মৌলিকত্ব'ও প্রবন্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে। উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহ পরবর্তীসময়ে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য : সাহিত্যক্ষেত্রে স্থিতিকালের স্বল্পতা এবং বয়সের স্বভাবধর্ম তাঁকে তাঁর প্রবন্ধসমূহে গৃহীত বিষয়সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করার ফুরসৎ দেয়নি। এ কারণেই, গভীরভাবে চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে নজরুলের পরিচিতি বা স্বীকৃতি সীমিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, তিনি বয়সের স্বভাবধর্মের কারণেই উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাকে উপেক্ষাও করতে পারেননি। উপরন্তু, তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথ নির্দেশনা দানে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। অবশ্য এর পিছনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল তাঁর কর্মসংস্থানের তাগিদ। এসব প্রণোদনায় তাঁর চিন্তাজগতে উদ্ভূত বিবিধ বিষয়চেতনার পাশাপাশি শিক্ষার প্রসঙ্গটিও স্থান লাভ করেছিল। তবে বলা যায়, শিক্ষা বিষয়ক চিন্তায় নিজেকে সর্বতোভাবে সম্পৃক্ত করার বয়স, সুযোগ ও মানসিকতা—কোনোটিই তাঁর অনুকূলে ছিল না। তাঁর বিচিত্র ভাবনা ও উপলব্ধির মধ্যে কখনো কখনো শিক্ষা বিষয়ক ভাবনাও উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত ওইসব উপলব্ধি

---

* প্রাক্তন প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তাঁর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট 'ধারণা'র পরিচয় পাওয়া যায়।

দুই

নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগবাণী' (১৯২২)। মোট বিশটি প্রবন্ধের সংকলন এ গ্রন্থ অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের (১৯২০-১৯২১) সময়ে রচিত। গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহ মূলত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় চাহিদা পূরণার্থে রচিত হলেও পরিবর্তীকালে এগুলো বিষয় ও বক্তব্যবিচারে সমকালের জীবন-প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে, শাশ্বত আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য : এ গ্রন্থের 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', 'সত্য শিক্ষা' - প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। আর অহযোগ আন্দোলনের নিরেট বাস্তব পটভূমিতে, যখন স্বাধীনতার আশা সুদূর পরাহত, তখনই তিনি উপনিবেশ মুক্ত স্বদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর এ চিন্তার বাস্তব পরিসমাপ্তি ঘটেছে—জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি স্বাধীন ভারতবর্ষ পত্তনের মধ্য দিয়ে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বিদেশি পণ্য বর্জনের পাশাপাশি বিদেশিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করার যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল, তার প্রতি নজরুল ইসলামের সমর্থন ছিল। তবে অসহযোগ আন্দোলনের সামগ্রিক কর্মসূচির প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না। স্বকীয় বিবেচনায় তাঁর কাছে যেটুকু গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, সেইটুকুই গ্রহণ করেছেন এবং তা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সরকারি বিদ্যালয়ে প্রচলিত বিজাতীয় পাঠক্রম বর্জন করে, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশীয় জীবন পদ্ধতি এবং সংস্কৃতি-ঐতিহ্যসম্পৃক্ত পাঠদান কর্মসূচির প্রতিই তাঁর সমর্থন ছিল। উল্লেখ্য : শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের গণ্ডিমুক্ত করার প্রয়াস ছিল—ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরাধীন ভাতরবর্ষে সংগঠিত প্রায় সকল আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক। নজরুল ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই বিজাতীয় সংস্কৃতির অযাচিত অনুকৃতি বিমুক্ত এবং জাতীয় বিশেষত্ববহুল শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার পথ উন্মুক্তকরণে তাঁর চিন্তা ও সর্বাত্মক প্রয়াস কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। সরকারি বিদ্যালয়ের পরিবর্তে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্বতোভাবে অনুভব করেছেন। আর এর সফল বাস্তবায়নের জন্য জনমানুষের সর্বাত্মক ও সম্মিলিত সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা তাঁর একান্ত কাম্য ছিল। কেবল ঝোঁকের বশে, উদ্দেশ্যবিহীন ও বিশেষত্বহীন প্রতিষ্ঠান গঠনের

বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অবস্থান। আসলে, বিজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির অযাচিত হস্তক্ষেপ ও অপপ্রয়োগের ফলে দেশীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষার যে সম্পর্কচ্যুতি, তাকে পুনর্গঠিত করাই বা অতীতের সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপনই নজরুল ইসলাম সমর্থিত 'শিক্ষা'র মূল উদ্দেশ্য।

নজরুল ইসলাম শুধু জ্ঞানার্জনের নামে 'শিক্ষাগ্রহণ'-এর পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে, স্বদেশীয় উপাদানবহুল 'শিক্ষা' জাতীয় চরিত্রের রূপগত পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। অন্যদিকে চাপিয়ে দেওয়া বিজাতীয় শিক্ষার দায়ভারে মানুষের আত্মসুখ ও আত্মপ্রেরণা নির্জীব হতে বাধ্য। আবার স্বদেশের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনাসম্পৃক্ত শিক্ষার সংস্পর্শেই আত্মসুখরহিত সুপ্ত প্রেরণা নির্ভীক স্পর্ধায় জেগে ওঠে। অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় স্বদেশের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্তি তরুণ হৃদয়ে জ্বেলে দিতে পারে মহাশিক্ষার আলোকবর্তিকা। তাই শিক্ষা প্রসঙ্গে নজরুলের অভিমত : সর্বাগ্রে সেই ধরনের শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন, যাতে থাকবে দেশের মাটির গন্ধ, বীর ও বীরত্বের বিজয়গাথা। জাতীয় জীবনের বাহ্যিক মুক্তির জন্যে অন্যবিধ প্রয়াস গ্রহণের পূর্বে এটাই একমাত্র উপায় বলে তাঁর বিশ্বাস।

> জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশসেবকের চরিত্রও জীবন গঠিত হইবে, বিদেশের বিজাতির বিষাক্ত বাষ্প লাগিয়া তাদের মঞ্জরিত জীবন পুষ্প শুকাইয়া যাইবে না, বল প্রয়োগে তাহাদিগকে মিথ্যা স্বজাতি-স্বদেশে অনাস্থা শিখাইয়া আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী অলস-অকেজো করিয়া তোলা যাইবে না - ইহাই কি কম সুখের কথা। তাহারা শিখিবে দেশের কাহিনী, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতার পৌরুষ, স্বধর্মের সত্য—দেশের ভাইয়ের কাছ হইতে তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্মীর ত্যাগ ও কর্ম, নির্ভীকের সাহস, দেশের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া—ইহা কি কম আনন্দের কথা। - 'সত্য-শিক্ষা'/যুগবাণী

সৃজনশীলতা চর্চার পরিবর্তে বিজাতীয় বিদ্যার্জনের অন্ধ অনুকরণে এবং তদ্বিষয়ে লব্ধজ্ঞান দেশীয় ঐতিহ্যকে বিদূরিত করে এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে মানসবোধের যোগসূত্র সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সার-সত্য যাচাই না করে বিদেশি শিক্ষাকে গ্রহণ করা, নিজস্ব শিক্ষার চিরায়ত ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করার সামিল। আর দেশীয় ঐতিহ্য ও বিশেষত্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ও মনীষারই চরম অবমাননা।

> পরের সমস্ত ভালো–মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায়, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহায়েৎ খর্ব করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেযত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। – 'সত্য-শিক্ষা'/যুগবাণী

নজরুল ইসলাম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশরক্ষায় ও জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব সংরক্ষণের সর্বপ্রধান কাজ হলো : শিক্ষার সংস্কার সাধন করা। এটাই একজন দেশ-সেবকের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত বলে তাঁর ধারণা। কারণ বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে দেশি ঐতিহ্যের পরিসীমা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। আর নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্করহিত মানুষের জীবনের অভ্যন্তর ও বাহ্যিক মুক্তির ইচ্ছা অলস ও অকেজো হতে বাধ্য। এজন্য তিনি প্রথমেই দেশের মাটি ও মানুষ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যসম্পৃক্ত শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা : জাতীয় বিদ্যালয়কে যথার্থরূপে গড়ে তুলতে পারলে নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির সমন্বয়ে শাশ্বত মনুষ্যত্বের চর্চা সম্ভবপর হবে এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী বোধ থেকে উত্তরণের মাধ্যমে বিশ্বচেতনায় উপনীত হওয়া যাবে। আর এ বিষয়ে সাফল্য অর্জনের মধ্যেই আমাদের যথার্থ মুক্তি। উল্লেখ্য : নবপ্রবর্তিত শিক্ষার সঙ্গে এদেশীয় মানসবোধের সম্পর্ক সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এসবের যথার্থ চর্চা ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে 'কল্যাণ'-এর আগমন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ে এর বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নজরুল এভাবেই শিক্ষাবিষয়ে সুচিন্তিত মত প্রকাশের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির পথ নির্দেশনা দান করেছেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নজরুল ইসলামের দু'টি মৌল ধারণা : সৃজনশীলতার চর্চা এবং ব্যবহারিক জীবনের মুক্তি। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা যেহেতু এদেশীয় জীবনপদ্ধতি ও ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন, সেজন্য এ ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : বিদেশি শিক্ষাকে ঢালাও ভাবে বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না নজরুল ইসলাম। দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিংবা দেশীয় চেতনা বা বোধের পরিপন্থী নয়, এ ধরনের বিদেশি শিক্ষা উপাদান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল।

> সরকারী বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় হয় বলিয়াই যদি আমরা তাহাকে 'তালাক' দিই, তাহা হইলে আমরা আমাদের শিক্ষার পরিপুষ্টির জন্য বা মনের মত শিক্ষা দিবার জন্য যে বিদ্যাপীঠ খাড়া করিয়াছি বা করিব, তাহা কিছুতেই ঐ সরকারী বিদ্যালয়ের নামান্তর বা রূপান্তর হইবে না। তাহা হইলে টকের ভয়ে আমরা

> বৃথাই বাঁধা বাসা ফেলিয়া পলাইয়া আসিলাম, কেননা আবার আমাদের আর এক রকম 'টকবৃক্ষ'-এরই ছায়াতলে আশ্রয় লইতে হইল। - 'জাতীয় শিক্ষা'/ যুগবাণী

যে টুকু প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয়, অবশ্যই তিনি তা 'ভাল-মন্দ জ্ঞান'-এর কষ্টিপাথরে যথার্থরূপে যাচাই করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। উল্লিখিত প্রসঙ্গসূত্রে তাঁর ধারণা, দেশ ও কালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

আমরা জানি, কাজী নজরুল ইসলাম আজীবন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেছেন। আর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য তাঁর বহুমুখী তৎপরতা ক্রিয়াশীল ছিল। তবে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হিসেবে তিনি জাতীয় জীবনের বহুবিধ সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করেছেন। এর অন্যতম হলো : স্বকীয়তা বিশেষত্ববর্জিত প্রচলিত 'বিজাতীয় শিক্ষা'। এ বিষয়ে এদেশীয়দের সচেতন করে তোলার ব্যাপারে তিনি সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি, তিনি প্রত্যাশা করেছেন, বিজাতীয় শিক্ষার কবল মুক্ত এবং স্বদেশ-সংস্কৃতির সৃজনশীল চিন্তা ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষ। কারণ তিনি জানতেন, স্বদেশীয় শিক্ষা-ইতিহাস-সংস্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে জাতিসত্তার মৌল উপাদান,—বীরত্ব ও বিজয়গাথা। মোটকথা, জাতিসত্তা-সম্পৃক্ত শিক্ষাই তাঁর কাঙ্ক্ষিত 'শিক্ষা'। তাঁর ধারণা, জাতিসত্তার বোধশূন্য বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সার্বিক কল্যাণ সাধন অসম্ভব। এজন্য জাতীয় ঐতিহ্যের গর্বে উজ্জীবিত স্পর্ধিত তারুণ্যের অংশগ্রহণও প্রয়োজন। আর এরূপ শিক্ষার মাধ্যমেই বুদ্ধিবৃত্তি ও তারুণ্য - এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর। এটাই পরাধীনতা অবসানের লক্ষ্যে জাতীয় জীবনের জন্য উপযুক্ত 'শিক্ষা'। উল্লেখ্য : অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ গৃহীত হয়, তাতে তিনি সর্বৈব সমর্থন প্রদান করেননি। কারণ তাঁর ধারণা, শুধু আন্দোলনের সমর্থনে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। আসলে, জাতীয় জীবনের প্রয়োজন অনেক আগেই এ ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হওয়া উচিত ছিল বলে তাঁর অভিমত।

> আজ ইংরেজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি বলিয়াই যে রাগের মাথায় যেন তেন প্রকারের দু-একটা ঠাটকবাজী-গোছ জাতীয় স্কুল কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয় ; অহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।— 'সত্য-শিক্ষা'/ যুগবাণী

শিক্ষাবিষয়ে এ ধরনের চিন্তাভাবনা অবশ্যই তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। আসলে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, "বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে।" – 'সত্য-শিক্ষা'/যুগবাণী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই প্রথম উত্থাপিত হয়নি। স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) কালেও এ ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তা সাফল্যের মুখ দেখেনি, এই কারণে যে, শুধু বাহ্যিক পরিবর্তিনে, তা যে কোনো ধরনেরই হোক, অন্তর সত্যের সম্পূর্ণতর পরিবর্তন কিংবা নবতর বিকাশ অসম্ভব। এজন্য অভ্যন্তর পরিবর্তন সংঘটনের বিষয়টিও জরুরি। প্রচলিত বিলাতি শিক্ষায় শুধু উপরিকাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়ে জতীয় বিদ্যালয়ে নব-প্রস্তাবিত যে-শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, তাতে দেশীয় উপাদান উপকরণ ছিল বটে, কিন্তু মৌলিকত্বের বিচারে তা ছিল অপর্যাপ্ত। পরবর্তীকালে আবারও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এদেশীয়দের পুনর্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ইসলাম নব প্রস্তাবিত শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে ভাবিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষা : বাহ্যিক ও অভ্যন্তর বৈশিষ্ট্যে একান্তভাবেই দেশীয় মানসিকতা, আবহাওয়া ও উপাদান সম্পৃক্ত। তা কখনোই বিজাতীয় চিন্তার ও কর্মের উপর শুধু চাকচিক্যময় প্রলেপ সর্বস্ব 'শিক্ষা' নয়। অর্থাৎ জাতিসত্তার প্রাণস্পন্দময় সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গড়া 'শিক্ষা', যা জাতীয় জীবনের পরিবর্জনের পাথেয় হতে পারে।

> এখন যে পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল নব-উদ্ভাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছে, তাহাও কি ঐ রকম বিলাতি শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া "স্বদেশী" মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মত। শিক্ষায় যা একটু মৌলিকতা দেখা যাইতেছে, তাহা কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য নয়। ও রকম একটু-আধটু নূতনত্ব যে কেহ একটা নূতন জিনিসে লাগাইতে পারে। যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ঐ সরকারী বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না। যাহা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, যাহা অন্যের ভুল দাগে দাগা-বুলানো মাত্র, তাহাকে কি বলিয়া কোন্ লজ্জায় 'হামারা' বলিয়া বুক ঠুকিয়া তাহাদেরই সামনে দাঁড়াইব – যাহাদিগকে মুখ ভেঙচাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল আবার

> তাহাদেরই হুবহু 'হনুকরণ' করিতেছি। ... কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিয়া ভণ্ডামী দিয়া কখনও মঙ্গল উৎসবের কল্যাণ প্রদীপ জ্বলিবে না। শুধু চরকা দিয়া সুতা কাটানো ছাড়া এ-ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে তেমন কিছু নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের ছেলেদের মনের বা এদেশের আবহাওয়া উপযোগী। এসবই ইংরেজী কায়দা কানুনকে যেন মাথায় পগ্‌গ ও পায়ে নাগারা জুতা পরাইয়া এদেশী করা ; অথবা সাহেবকে ধূতি ও মেমকে শাড়ি পরাইয়া বাবু ও বিবি সাজানো গোছ। – 'জাতীয় শিক্ষা'/যুগবাণী

শুধু স্বদেশী শিক্ষা প্রবর্তনের মধ্যেই নজরুলের আত্মতুষ্টি সীমিত থাকেনি। তিনি এ প্রয়াসকে সটিকরূপে বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন। অথচ বাস্তবে-স্বজনপ্রীতিমূলক শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের স্বার্থসিদ্ধির যে প্রচেষ্টা, তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য লোক দেখানো স্বার্থত্যাগের অন্তরালে উদ্যোক্তাদের স্বার্থসিদ্ধির যে লোভ—তা সমুদয় কল্যাণকর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ধ্বস নামাবে, নজরুল এ ধরনের ভাবনা থেকে মুক্ত ছিলেন না। কারণ তাঁর উপলব্ধি এই যে যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতিতে নব প্রবর্তিত শিক্ষা ও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

নজরুলের উপলব্ধি সঞ্জাত শিক্ষা : প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তির সমন্বিত আধার।

> আমরা চাই, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। 'মেদামারা' ছেলের চেয়ে সে হিসাবে 'ডানপিঠে' ছেলে বরং অনেক ভালো। কারণ পূর্বোক্ত নিরীহ জীবরূপী ছেলেদের 'জান' থাকে না ; আর যাহার জান নাই সে মোর্দা দিয়া কোনো কাজই হয় নাই, আর হইবেও না। এই দুই শক্তিকে—প্রাণশক্তি আর কর্মশক্তিকে একীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় ; ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। – 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/যুগবাণী

অর্থাৎ নজরুল ইসলামের অভীষ্ট শিক্ষা : দেশীয় ঐতিহ্যসম্পৃক্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, ব্যতিক্রমী ও সমন্বিত 'শিক্ষা'।

তিন

কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তায় নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ

সম্মেলনে' সভাপতির অভিভাষণে তিনি পুরুষের শিক্ষার পাশাপাশি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। কারণ শুধু নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনেই নয়, যোগ্যতাসম্পন্ন আগামী প্রজন্ম প্রাপ্তির প্রত্যাশায়ও নারীশিক্ষা প্রয়োজন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে,"যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্যসুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীরসন্তান' জন্মের আশা অবান্তর। আসলে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন ও উন্নয়নের লক্ষ্যকে সত্যিকার সাফল্যের পথে পরিচালিত করতে নারীশিক্ষার বিকল্প নেই। নারী-পুরুষের যৌথ প্রয়াসেই সুন্দর আগামী বির্নিমাণের পথ সুগম হতে পারে। তাই শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের পথে পুরুষ ও নারীর বৈষম্য ও ভেদনীতিকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। এমনকি, জ্ঞান ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ মুসলিম নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় সংকীর্ণতারও সমালোচনা করেছেন। মোটকথা, শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের ভেদনীতির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ নজরুল মুসলিম সমাজের পশ্চাৎমুখিনতা-সংকীর্ণতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং জীবনকে বিকশিত করার জন্যে নারীশিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ মনে করেছেন।

> কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহমন এমনি করিয়া পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ কিসের অভাব যে তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফকর করিব, অথচ জানি না - সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে - নারী। 'তরুণের সাধনা'/অভিভাষণ

নজরুল ইসলাম মনে করতেন, শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য : জ্ঞান-আহরণ ও মুক্তবুদ্ধিচর্চা। এর মধ্য দিয়েই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ অর্জন সম্ভবপর। কিন্তু যে শিক্ষা শুধু চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে অর্জিত, তা মানুষের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি—উভয়কেই সীমিত করে। আর স্বাভাবিকভাবেই এতে প্রকৃত জ্ঞান আহরণের লক্ষ্য বাধাগ্রস্ত হয় ; ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রচেষ্টাও হয়ে ওঠে অর্থহীন। তাই শুধু চাকরি লাভের প্রত্যাশায় সমসময়ের মুসলিম তরুণ সমজের শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতায় নজরুল ইসলাম একই সঙ্গে বিস্মিত ও দুঃখভারাক্রান্ত। তাই তিনি ওইসব তরুণদের প্রতি শুধু চাকরি লাভের জন্য নয়, প্রকৃত শিক্ষালাভের মাধ্যমে সমাজ ও

জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনের ব্রত গ্রহণের মোহমন্ত্র উচ্চারণ করেন।

ক. ... আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকরী অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসপেক্টের' মত আমরা ঐ চাকরীর দিকে তীর্থের কাকের মত হা করিয়া চহিয়া আছি। বি.এ. এম. এ. পাশ করিয়া কিছু যদি না হই অন্তত সাবরেজিস্টার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্ন যাহাদের গতি-তাহদের কি আর মুক্তি আছে? এই ভূত ছাড়িয়া না গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। 'তরুণের সাধনা'/অভিভাষণ

খ. তোমাদের শিক্ষা তোমাদের জ্ঞান তোমাদের মাঝেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ শিক্ষা, বর্জন করো এ জ্ঞানার্জন। নওকরির জন্য দাসখৎ লিখার কায়দা-কানুন শেখার জন্য যদি তোমরা শিক্ষার ব্রত গ্রহণ কর, তবে জাহান্নামে যাক তোমাদেরই এই শিক্ষাপদ্ধতি, এই শিক্ষালয়।

তোমাদের শিক্ষায়তন—তা স্কুলই হোক,আর কলেজই হোক, আর মাদ্রাসাই হোক, পীরের দর্গার চেয়েও পবিত্র, মসজিদের মতই পাক। এর অঙ্গনে যে দীক্ষা কর, যে নিয়ত কর, জীবনে যদি সে ব্রত ফলপ্রসূ না হয় তবে কাজ কি এই জীবনের এক তৃতীয়াংশ বাজে খরচ করে। – 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও'/অভিভাষণ

যা সত্য তাই সুন্দর। এই সুন্দরই আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বিধান করতে সক্ষম। সুকুমার বৃত্তি পরিচর্যার মাধ্যমে 'সুন্দর'-এর সান্নিধ্য লাভ সহজ হয়। এতে জ্ঞান, মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, মানবজীবন সুন্দর ও সার্থক হয়। তাই সুকুমার বৃত্তিচর্চার বিষয়টি নজরুলের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু এ সুকুমার বৃত্তি বিকাশের বিরুদ্ধেই এদেশীয় মোল্লাশ্রেণী সার্বক্ষণিক তৎপরতায় সক্রিয়। এর ফলে মুসলমানদের জন্মগতভাবে অর্জিত এতদ্বিষয়ক প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মুসলিম সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অবশ্যই হৃদয়বৃত্তি বিকাশের সহায়ক শিক্ষাও প্রয়োজন। এ সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন নজরুল ইসলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে, এমনকি বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশে মুসলমানদের সংস্কৃতি-চর্চার যে গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য, তা স্মরণ করেছেন। তাঁর ধারণা, সুকুমার বৃত্তিচর্চার মাধ্যমে মানুষ বাহ্যিক ও মানসিক সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে, প্রকৃত শিক্ষাবঞ্চিত জীবনের গৌরবহীন বেঁচে থাকা, তার কাছে মৃত্যুরই নামান্তর।

> পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছু থাকে না। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরূহ অনেক বড়-শ্রেষ্ঠ। – 'তরুণের সাধনা'/অভিভাষণ

পরস্পর ভাব বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যমে ভাষা। নজরুল ইসলাম ভিন্ন ভাষা শিক্ষার এ-বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, নিজস্ব ভাষার সীমানা অতিক্রম করে ভিন্ন ভাষার দুর্গে প্রবেশের মাধ্যমেই বিশ্বসভ্যতার সংস্পর্শে এসে নিজের ও অন্যের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব ; বিশ্ব শাস্ত্র-সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে পরিচিতি অর্জন করা সহজতর। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতির অভিভাষণে নজরুলের উপরি-উক্তি চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তবে বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রতি তাঁর সমর্থনের পূর্বশর্ত : মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও সামগ্রিক ধারণা অর্জন। কারণ, মাতৃভাষায় পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের ব্যর্থতাই অন্য 'ভাষা'র সুকঠিন ভিত্ নির্মাণের অন্তরায়। একমাত্র মাতৃভাষায় পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়েই ভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করার পথ সুগম হয়। সুতরাং মাতৃভাষার স্বরূপ চর্চা ও তাতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য অর্জনই তাঁর দৃষ্টিতে সচেতন মানুষের প্রথমতম দায়িত্ব।

> কোনো মুসলমান যদি তার ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায়, তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভাল করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাঙলাও ভাল করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি ; কাজেই ন মন তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। – 'মুসলিম সংস্কৃতিচর্চা'/অভিভাষণ।

সমকাল সচেতন নজরুলের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার নিবিড় স্পর্শযুক্ত। তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল ; সাম্প্রদায়িক চিন্তা উভয়ের মধ্যেই সক্রিয় ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘটনও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নজরুল উভয় সম্প্রদায়ের জন্য এমন উদারনৈতিক শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন, যে শিক্ষার মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের ধর্মীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যকরূপ জ্ঞাত হতে পারবে। আর পরস্পরের সামগ্রিক পরিচয় উপলব্ধি

করার পরিপ্রেক্ষিতেই, পরস্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল বিদ্বেষমূলক চিন্তা দূরীভূত হবে। নজরুলের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তার এভাবেই নিজস্ব ধর্মীয় বিষয়ের বাইরেও অন্য-ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়টিও এ ধরনেরও শিক্ষাচিন্তার মূল প্রেরণা।

ক. হিন্দু আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না। অথচ আমাদের শাস্ত্র সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবকিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবির মতই ঐ তিন ভাষাব হেরেমে বন্দী। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু করে ভাঙতে শুরু হয়েছে, ওদের মুখের বোরকাও খুলেছে, কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরকা মুক্ত হল না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের ঘরের মহিমা। অতএব অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোন কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশ্যই আমরাও অনুস্বারের সঙ্গিন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। – 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা'/অভিভাষণ

খ. আর ফার্সি জানার ফলে, তাঁরা (হিন্দুরা) মুসলমানদের বিশ্বসভ্যতায় দানের কথা ভাল করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত কোন মুসলমান নওয়াব বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলমান জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেনি। – (ঐ)

গ. ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি—শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটাও ভাঙছে—তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। – (ঐ)

মুসলিম তরুণ-সম্প্রদায়কে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করার পক্ষপাতী ছিলেন নজরুল ইসলাম। তাঁর মতে, ইসলামি শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ। এ শিক্ষা মানুষকে সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, দীনতা উপেক্ষা করে স্বাধীন জীবনযাপনের পথ নির্দেশনা দেয় ; অর্থাৎ নজরুলের শিক্ষাচিন্তা সর্ববিধ প্রতিকূলতা অতিক্রম করার শিক্ষা ; নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন না দেবার শিক্ষা। এজন্যেই শিক্ষা-কর্মসংস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়ার প্রতি তাঁর চরম অনীহা। অর্থাৎ অন্যের করুণায় বা আনুকূল্যে জীবনের বিকাশ সাধন—তাঁর কাম্য নয়। ১৩৪৭ সালে কলিকাতা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে নজরুলের অভিভাষণ, স্বাধীনচিত্ততার জাগরণের

সহায়ক এ-শিক্ষাচিন্তা অভিব্যক্ত হয়েছে।

> সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবীতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে। আমরা কারও নিকট মাথা নত করব না—রাস্তায় বসে জুতা সেলাই করব, নিজের শ্রমার্জিত অর্থে জীবনযাপন করব, কিন্তু কারো দয়ার মুখাপেক্ষী হব না। এই স্বাধীন চিত্ততার জাগরণ আজ বাঙলার মুসলমান তরুণদের মধ্যে দেখতে চাই: ইহাই ইসলামের শিক্ষা ; এ শিক্ষা সকলকে গ্রহণ করতে বলি। – 'স্বাধীন চিত্ততার জাগরণ'/ অভিভাষণ

নজরুলের শিক্ষাচিন্তায় কোনো বিশেষ শ্রেণীর মানুষের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। বরং সর্বশ্রেণীর মানুষের শিক্ষার অধিকারের কথা ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ দেশের জন মানুষের জন্য, নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে অজ্ঞ নিরক্ষর কৃষক সমাজের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। আর সর্ব সাধারণের জন্য গৃহীত এ শিক্ষাকার্যক্রমকে কার্যকর ও সফল করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি জনমানুষের চিরপরিচিত উপাদান-উপকরণে ও চির অভ্যস্ত পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এছাড়া তিনি শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাগ্রহীতার মধ্যে বিরাজিত বাহ্যিক ও মানসিক ব্যবধানের বিষয়টি সম্পর্কেও ভেবেছেন। কারণ, তাঁর ধারণা : এ দুয়ের মধ্যে বিরাজিত ব্যবধানের অবসানের মাধ্যমেই অভীষ্ট শিক্ষা লাভ সম্ভবপর। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার জনসাহিত্য সংসদের শুভ উদ্বোধনে সভাপতির অভিভাষণে শিক্ষা বিষয়ে তিনি তাঁর এ ধারণা ব্যক্ত করেন।

> ... ওদের জন্য যে সাহিত্য, ওরা এখনো যেমনভাবে পুঁথি পড়ে, আমির হামজা, সোনাভান, আলেফ লায়লা, কাছাছল আম্বিয়া পড়ে, তখনো সেইভাবে পড়বে। ওদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যা বলবার বলতে হবে। কিন্তু যেন মাস্টারি ভাব ধরা না পড়ে। সেইজন্য তথাকথিত ভদ্র-পোষাক পরিহিত ভদ্রলোকদের নেমে আসতে হবে কাদার মধ্যে – ওদেরকে টেনে তোলার জন্য। নেমে এসে যদি ওদের ওঠানোর চেষ্টা করা যায়, তবে তো চেষ্টা সফল হবে, নইলে না। – 'জন-সাহিত্য'/অভিভাষণ

অর্থাৎ নজরুল ইসলাম জাতীয় জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে সর্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

চার

নজরুল ইসলামের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন-সংস্কৃতির বিশেষত্ববহুল স্বজাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গ, প্রকৃত জ্ঞান আহরণ, মুক্তবুদ্ধিচর্চা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ, সুকুমার বৃত্তিচর্চা, বিবিধ ধর্মীয় শিক্ষা, ভিন্ন ভাষা শিক্ষা, নারীশিক্ষা, সর্বোপরি সর্বজনীন শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় স্থান লাভ করেছে। এ শিক্ষাচিন্তা প্রসঙ্গে তিনি যে বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন, তা হলো : শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার মধ্যে সদ্ভাবপূর্ণ সম্পর্ক এবং শিক্ষার্থীর জীবন ও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ। নিছক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়ে কিংবা বুদ্ধিবৃত্তি ও সুকুমার বৃত্তিচর্চারও মাধ্যমে, তিনি এদেশীয় মানুষকে নিজেদের সম্পর্কে সচেতন করতে ও পশ্চাৎপদতার মোহনিদ্রা থেকে জাগাতে চেয়েছেন। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রয়াসে, উপনিবেশিকতামুক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

আমরা জানি, মূলত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ কিংবা অভিভাষণ রচনার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধসমূহ রচিত। সুতরাং প্রবন্ধসমূহে সমসাময়িক বিষয় চিন্তা, আবেগ উপলব্ধির উপস্থিতিই স্বাভাবিক। কিন্তু নজরুলের এসব প্রবন্ধের অধিকাংশই সমসাময়িকতার সীমানা অতিক্রম করে বর্তমানকেও স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর প্রবন্ধসমূহে সাহিত্যগুণ ও চিরায়তবোধ—এ দুয়ের উপস্থিতি ও সুসমন্বয় প্রমাণিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য : বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে সর্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচিত হয়েছে এবং এর সফল বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছে। নজরুল তাঁর সমসময়েই জাতীয় উন্নয়নের জন্য এ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

নজরুল ইসলাম যে দার্শনিক চিন্তার দিক থেকে গভীর ছিলেন তা নয়। সেটা তাঁর কাছ থেকে আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু তিনি নানা বিষয়ে ভাবতেন এবং হৃদয় দিয়ে দেখতেন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা অল্প, তবে তাঁর চিন্তা ও দেখা যে নিজস্ব, সে-খবর আমরা এই প্রবন্ধগুলোতে পাই। নজরুল ইসলাম সবক্ষেত্রেই তাঁর নিজের মতো, এখানেও তাই।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *নজরুল রচনাবলী* (১ম ও ৪র্থ খণ্ড), আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সং, ১৯৯৩

২. *নজরুল চরিতমানস,* সুশীলকুমার গুপ্ত, কলিকাতা, ১৩৯৫

৩. *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি,* রফিকুল ইসলাম, কলিকাতা, ১৯৯৭

৪. *নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর,* আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাএ, ঢাকা, ১৯৮৭

৫. *নজরুল পরিক্র*মা, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৩

৬. *একালে নজরুল,* আহমদ শরীফ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯০

৭. *নজরুল সমীক্ষণ,* মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৩৭৯

৮. *নজরুল সাহিত্য বিচার,* শাহাবুদ্দীন আহমদ, ঢাকা, ১৯৬৭

৯. *যুগ-কবি নজরুল,* আবদুল কাদির, বাএ, ঢাকা, ১৯৮৬

১০. *নজরুল : তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র,* মজিদ মাহমুদ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭

১১. *নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন,* সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৮ [অনু. আফজালুল বাসার]

১২. *নজরুল ইসলাম এবং অন্যেরা,* জামরুল হাসান বেগ, বাএ, ঢাকা, ১৯৯৮